জানুয়ারী, ২০১৩

এক এবং

১৫ টাকা

অদ্বিতীয়

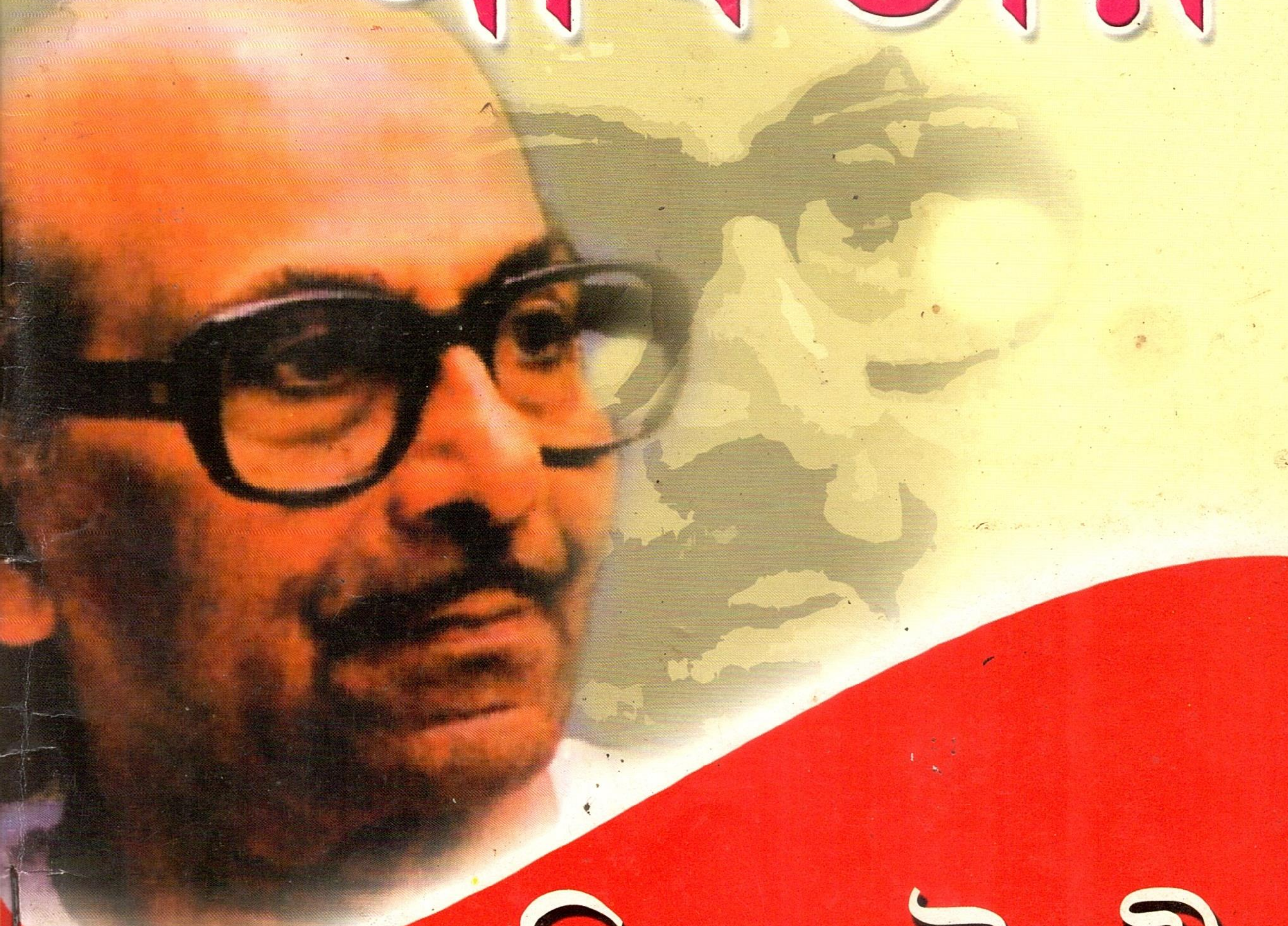

সলিল চৌধুরী

বাংলার অহংকার

বিবেকানন্দ কথা • সিনেমার ইতিহাস • গল্প • কবিতা • ভ্রমণ

মেয়েদের কথা • বিনোদন • ছোটদের পাতা • খেলা

25 JANUARY 2013

আমাদের কথা

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তারই মাঝে এসে গেল নতুন বছর। পুরনো বছরে পেয়েছি অনেক কিছু, হারিয়েছিও অনেক। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন রাজেশ খান্না, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর এবং আরো অনেকে। ভাল আর মন্দ নিয়েই পুরনো বছর গুলোকে এক এক করে আমরা ছেড়ে এসেছি। বার বার নতুন বছরে নতুন নতুন আশা নিয়ে বুক বেঁধেছি। এবারও সেই আশাগুলো রয়ে গেল। তবে বিশেষ করে আমাদের যেটা লাভ হয়েছে সেটা আপনাদের অফুরন্ত সহযোগিতা। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এমন সহয়োগিতা পাব আশাই করি নি। দোলাচলে ছিলাম আমাদের এই পত্রিকা নেবেন কিনা সেই সন্দেহ নিয়ে। দেখলাম আমরা আপনাদের চিনতে ভুল করি নি। কাজেই আরো দায়িত্ব বাড়ল। নতুন বছরের শুভেচ্ছা আর ভালবাসা জানিয়ে আবারও একবার আপনাদের আরো সহযোগিতার আশায় রইলাম।

ডঃ গুরুপদ দাস

প্রধান সম্পাদক

সম্পাদক

কল্যাণব্রত বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

অশোক সেনগুপ্ত ও দিলীপ দাশ

গ্রাফিক্স

অসীম রায়

সহযোগিতায়

স্বপন ভট্টাচার্য্য, অমিত সেনগুপ্ত,
সুব্রত দাস, শুভময় ঘোষ, অর্ঘ গণ,
নরেন্দু কর্মকার, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

কি আছে

প্রচ্ছদ কাহিনী

সলিল চৌধুরী বাংলার অহংকার

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র ৩ ॥ সংবাদ বিশেষ ৪ ॥ পুরানের কথা ৩৪
রীণাবৌদির রান্নাঘর ৩৭ ॥ রূপ লাগি ৩৯
সুস্বাস্থ্য ৪১ ॥ 'ছোটা'-ছুটি (কাছে ভ্রমণ) ৪৪
সিনেমার গল্প ৫৩ ॥ কলেজ ক্যান্টিন ৬১
হাসির টুকরো ৭৯ ॥ ছোটদের পাতা ৮০
খেলার খবর ৯৪ ॥ শব্দখেলা/মেলা-mail-e ৯৬

সাহিত্য, নাটক, কবিতা ও গল্প

বিয়ের আধুনিকিকরণ ৩১
বাবু - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৫
কবিতা ৪৮ ॥ নিরুদ্দেশ নীলকান্তমণি - অদ্রীশ বর্ধন ৪৯
নুতন অবতার - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[এখনকার মত করে নেওয়া] ৬৩
অ্যালার্জি ৬৯ ॥ শ্যামবাজারে মাওবাদী - দেবাশিস রায় ৭৬
একটি হাঁচির জন্য - ঋতব্রত বসু ৮৯
এক এবং অদ্বিতীয় - দি হরিনাথ দে ৯১
জীবন্ত ড্রাগন ৯২

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলা সিনেমার ইতিহাস ২৭
বীর সন্যাসী স্বামীবিবেকানন্দ ৭১

নিবন্ধ

মোশন পিকচার কি করে ২৫ ॥
সেরা গায়ক, সফল সুরকার ৫৮

প্রকাশনায়-
সাইন ইন্ডিয়া সিনেভিশন অ্যান্ড মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড,
৬/এ, ন্যায়রত্ন লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০০৪
মুদ্রণে-
হেমন্ত নস্কর, এস.পি এন্টারপ্রাইজ,
৩০/১, সার্পেন্টাইন লেন, কোলকাতা- ৭০০ ০১৪

যোগাযোগ - ৯০ ০৭ ৮০ ০৪ ০৪ ● E-mail- ekebongadwityo@gmail.com

প্রচ্ছদ কাহিনী

সলিল চৌধুরীকে শুধুমাত্র বাংলায় বেঁধে রাখাটা বোকামী কারণ এমন বিস্ময়কর প্রতিভা খুব কমই ভারতীয় সঙ্গীত জগতে এসেছে। এখানেও আবার ভুল করে ফেললাম। শুধু সঙ্গীত কেন, কবিতা বা লেখাতেও সলিল চৌধুরী অনন্য। আসলে এমন কিছু প্রতিভা আছে যাঁদের শুধুমাত্র কথায় বা লেখায় মাপা যায় না। তাঁদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। সলিল চৌধুরী তাঁদেরই একজন। উঁচু থেকে নিচু সবশ্রেণীর মানুষকে দেখেছেন দূরবীন দিয়ে নয়, একেবারে কাছ থেকে। মাটির কাছাকাছি যে সব মানুষ থাকেন তাঁদের সঙ্গে মিশেছেন নিজের গরজে। ফলে তাঁর গানে যে সব সুর এসেছে তাতে মিশে আছে মাটির সোঁদা গন্ধ, বাঁশির মিঠে সুর, ভেতরের না পাওয়া ক্ষোভ, আধপেটা খিদের জ্বালা, আজীবন বঞ্চনার প্রতিবাদ। এতো বলিষ্ঠ সুর খুব কম পাওয়া যায়। প্রতিটা গান শুনলেই বোঝা যায়, অনুভব করা যায় ভেতরের সেই প্রতিবাদের ভাষা, যে ভাষায় তিনি প্রতিনিয়ত বলে গেছেন। এর জন্যেই তিনি অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা। সুরের রাজমহলে বসে তিনি গান লেখেন নি, তিনি গান লিখেছিলেন শ্রমিক বা কৃষকের ছেঁড়া মাদুরে বসে, সুর করেছিলেন ছন্নছাড়া মানুষগুলোর সাথে আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে। এই রকম এক মানুষকে নিয়ে বাঙালী অহংকার করবে না তো কাকে নিয়ে করবে?

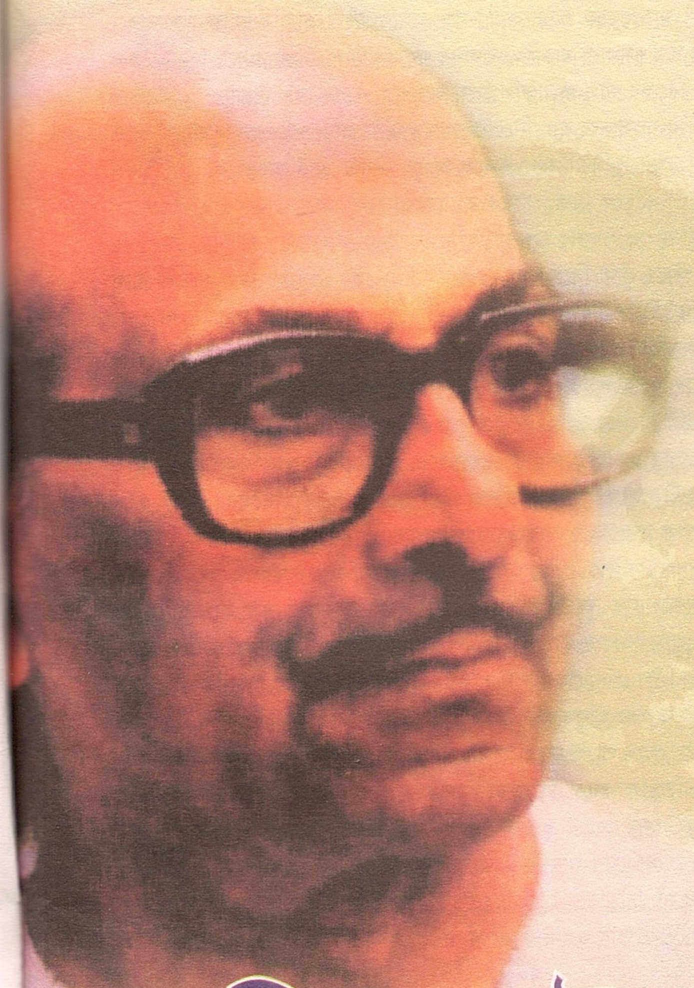

সলিল চৌধুরী

বাংলার অহংকার

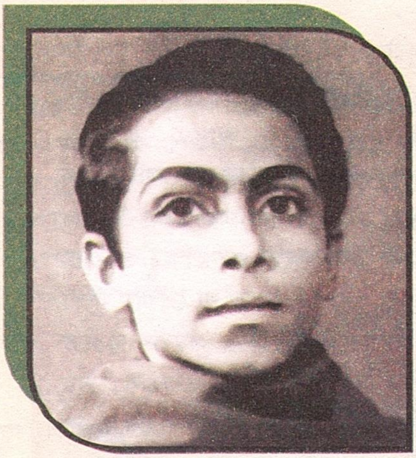

১৯২৩ সালের ১৯শে নভেম্বর সলিল চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন এই পোড়া বাংলার এক পোড়া গ্রামে, যা নামেই সোনারপুর। ছোটবেলাটা কাটে হরিনাভিতে। বাবা ডাক্তারি করলেও মিশতেন সবার সঙ্গে, মনটাও ছিল ভীষণ উদার। চাকরীসূত্রে আসামে এলেন এক চা বাগানে। দিনে ডাক্তারি আর রাতে চা-বাগানের কুলিকামিনদের সঙ্গে বসে তাঁদের সুখদুঃখের কথা শোনা, এই ছিল তাঁর কাজ। তিনি এই চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়েই গড়ে তোলেন এক নাটকের দল। বাবার সঙ্গে থেকে থেকে ছোট্ট সলিলও কেমনভাবে যেন জড়িয়ে পড়লেন এই সব মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের সঙ্গে। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার। বাবার সখ ছিল পশ্চিমী ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনার। সংগ্রহও ছিল খুব ভাল। তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন দেশে ফিরে যাওয়া এক আইরিশ

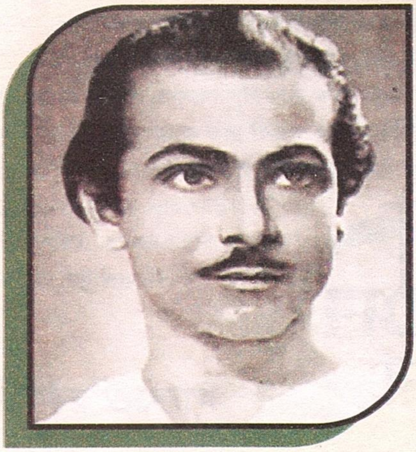

ডাক্তারের কাছ থেকে। সলিলেরও সেগুলো শুনতে খুব ভাল লাগত। আস্তে আস্তে সলিল মজে গেলেন মোৎজার্ট, চায়কোভস্কি বা বেটোফেনের সাথে। আর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন এই সব অসাধারণ মিউজিকের স্বাদ বিলিয়ে দিতে হবে সাধারণের মধ্যে। এরপরেই পূর্ব আর পশ্চিমের সঙ্গীত ধারার মধ্যে অপরূপ মেলবন্ধন ঘটালেন সলিল। ইতিমধ্যে কোলকাতায় এসে সলিল চৌধুরী ভর্তি হলেন বঙ্গবাসী কলেজে। সালটা ১৯৪৪। অগ্নিগর্ভ ভারত, বাংলাও সেই আগুনের আঁচ থেকে বাইরে নেই। সলিলও বাদ পড়লেন না। এই সময় এমন এক সময় যার থেকে আজকের সময়ের মধ্যে ছিল হাজার যোজন ফারাক। তখনকার তরুণসমাজ মানেই একদঙ্গল যুবক যাঁদের চোখে রয়েছে দিন বদলের প্রতিজ্ঞা। নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেশ উদ্ধারে। এখনকার মত স্বার্থপর যুবসমাজ নয়, নিজের স্বার্থের জন্য তারা পাশের মানুষটাকে ভুলে যায় নি। তখন কমিউনিজম বলতে মানুষ চিনত এক আদর্শকে, যে আদর্শ সমাজের উঁচু-নীচুকে এক আসনে বসাতে চায়। আজকের মত শুধু রাজনীতি নির্ভর ছিল না সে আদর্শ। তখনকার যুবসমাজের এক বড় অংশ যোগ দিল সেই আদর্শকে কাঁধে তুলে নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। ১৯৪৫ সালে সলিল যোগ দিলেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে। তিনি হাতে গান (gun) নয়, কন্ঠে তুলে নিলেন গান-কে। এবং সত্যিই দেখিয়ে দিলেন সঙ্গীত কত শক্তি ধরে রাখতে পারে। বাংলার প্রতিটি গ্রাম থেকে শহর সলিল ছুটে বেড়াতে লাগলেন আইপিটিএ-র একজন নিরলস কর্মী হিসেবে তাঁর সুরের যাদুকে ছড়িয়ে দিতে। সেই সময় আইপিটিএ মানে প্রতিভার ছড়াছড়ি, নাটক থেকে গান, সবেতেই ছিলেন এমন কিছু মানুষ যাঁরা পরবর্তী সময়ে তাঁদের প্রতিভা দিয়ে ভারতসেরা হয়েছিলেন। নাটকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়রা যেমন ছিলেন সে রকমই গানে ছিলেন হেমন্ত, সলিল, দেবব্রত প্রভৃতিরা। বাংলা তখন থরথর করে কাঁপছে কৃষক আন্দোলনের দুর্বার গতিতে। সেই আন্দোলনের শরিক হয়ে একদিকে দেবব্রত বিশ্বাস যেখানে মাঠ কাঁপাচ্ছেন, 'বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই দিয়ে', তখন অন্যদিকে সলিল শোনাচ্ছেন 'রানার' বা 'অবাক পৃথিবী'। তোলপাড় করা সেই সময়ে এইসব গান মানুষকে করে তুলল আরো লড়াকু। মানুষ তাঁর অধিকার ছিনিয়ে নিতে নেমে পড়ল মাঠে-ময়দানে, গ্রামে-গঞ্জে। চারণকবি মুকুন্দদাস যেমন গানকে হাতিয়ার করে অচেতন মানুষগুলোকে ঘা মেরে জাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন, সেই একই কাজ আবার নতুন করে করলেন সলিল চৌধুরী। ঝিমিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে সঞ্চার করলেন নতুন প্রাণের জোয়ার। মাত্র ২০ বছর বয়সে সুর দিয়েছিলেন 'গাঁয়ের বধূ'তে। আর এই এক সুরের ঘায়ে বাংলার সঙ্গীত জগতে তৈরি হল এক নতুন ধারা, যে ধারায় আজও প্রতিনিয়ত নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছেন নতুন পুরনো সব যুগের মানুষ। আইপিটিএ-র ব্যাপারে একটা মজার কথা এখানে বলে রাখি, সলিল আইপিটিএ-তে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন একজন বাঁশি বাজিয়ে হিসেবে। তারপর একদিন কি করে কে জানে সবাই আবিস্কার করলেন সলিল লেখেনও দুর্দান্ত আর সুরটাও দেন বেশ জ্বালাময়ী। ব্যস, শুরু হয়ে গেল সলিলের নতুন জীবন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই অগোছালো মানুষটির অসাবধানতার ফলে তাঁর বহু অসাধারণ লেখা আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। আইপিটিএ করার সময় খুব সামান্য কিছু টাকা হাতে পেতেন, তা দিয়ে পেট ভরানোই দায় তো ঘোরাফেরা। কাজেই বেশিরভাগ সময়

সলিল চৌধুরী বাংলার অহংকার

এই মানুষটিকে ভরসা করতে হত তাঁর নিজের দুপায়ের ওপর। এমন অনেক দিন গেছে হয়ত না খেয়েই কাজ করে যেতে হয়েছে। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন তাঁর আশপাশের বহু সহযোদ্ধাকে শাসকের অসহনীয় অত্যাচারে মৃত্যবরণ করতে। দিনের পর দিন তাঁদের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে শাসকের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে। এই সব পরিবেশ থেকেই তিনি তৈরি করেছেন একের পর এক অমর সৃষ্টি। অবশ্য এটাও ঠিক কাচের ঘরের আরামে বসে তিনি কোনোদিনই এসব সুর তৈরি করতে পারতেন না। নিদারুণ কষ্ট, মানুষের অসহায়তা, অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত তাদের প্রতিদিনকার অবস্থা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন। তবেই তিনি পেরেছিলেন এমন যুগান্তকারী সব সুর সৃষ্টি করতে। সেইসব মানুষের প্রতিবাদকে প্রখরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের লেখায়, নিজের সুরে। কিন্তু এত কিছু করেও থাকতে পারলেন না আইপিটিএ-তে। সংঘাত শুরু হয়ে গেল একতরফাভাবে। সলিলের সাফল্য অনেকেই ভালোচোখে নিলেন না। শুরু হয়ে গেল তাঁকে নিয়মের বেড়াজালে বেঁধেফেলার এক বেনিয়ম খেলা। সলিল বাধ্য হলেন আইপিটিএ ছাড়তে। বাঁধনছাড়া সলিল এবার কি করবেন? সামনে রয়েছে সারা বিশ্ব, শুধু জয় করে নেওয়ার অপেক্ষা। সঙ্গে আছে কঠিন বাস্তবের রুক্ষ অভিজ্ঞতা, শানিত লেখনি আর মাতিয়ে দেওয়া সুরের অপ্রতুল ভান্ডার। ঠিক এই সময়ে যোগাযোগ হয়ে গেল বাংলা ফিল্মের এক পরিচালকের সঙ্গে। ১৯৪৯ সালে প্রথম সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করলেন 'পরিবর্তন' ছবিতে। এর পরে ডাক পেলেন বোম্বে থেকে। বিমল রায় নতুন সঙ্গীত পরিচালক খুঁজছেন তাঁর নতুন ছবির জন্য। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পেল তাঁরই সঙ্গীত পরিচালনায় 'দুই বিঘা জমিন'। এই ছবির মাধ্যমে বোম্বেতে কদর পেলেন দারুণভাবে। বেশ ভালও

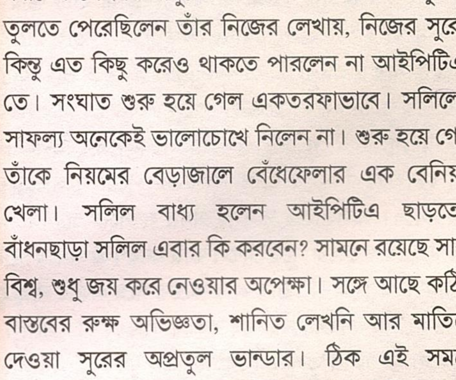

লেগে গেল বলিউডের পেশাদারী মনোভাব। চলে এলেন পাকাপাকিভাবে বোম্বেতে। ১৯৫৭ সালে কিশোরকুমারের তখনকার স্ত্রী রুমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে তৈরি করলেন 'বোম্বে ইউথ কয়ার'। পশ্চিমী সঙ্গীতকে ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশিয়ে কাজ করার ইচ্ছে ছিল বহুদিন। এবার তা মিটল। মনের সুখে সঙ্গীতের ওপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে গেলেন বোম্বে ইউথ কয়ার নিয়ে। দো বিঘা জমিনে অসাধারণ সাফল্য তাঁকে এনে দেয় আরো অনেক ছবির অফার। একের পর এক করলেন বহু ছবি। এরমধ্যেই ডাক পেলেন মালয়ালাম ছবি থেকে। করলেন 'চেমিন'। এখানেও পেলেন দারুণ সাফল্য। এর পর একে একে কাজ করলেন তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, অসমিয়া বা ওড়িয়া ছবিতে। পাশাপাশি বাংলা ছবিতেও কাজ করে চলেছেন তিনি। তবুও মন ভরল না। আসলে অর্ডারি গান করা তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি চাইছিলেন আরো অনেক কিছু করতে। সেই সব কাজ করতে গেলে তাঁকে তা করতে হবে স্বাধীনভাবে। তাই মনস্থির করে ফেললেন, না, আর নয়। ১৯৭৫-এ ফিরে এলেন কোলকাতায়। শুরু করলেন নিজের মত করে কাজ করা। সলিল চৌধুরী জীবনে অনেক কিছু মেনে নিতে পারেন নি। সমঝোতা করতে পারেন নি তাঁর নিজের সাথেও। ইচ্ছে করলে যশ, অর্থ বা আরো অনেক কিছু পেতে পারতেন খুবই সহজে। সলিলের চাইতেও অনেক কম প্রতিভার মানুষ তাঁর চাইতেও অনেক বেশি বিত্তবান হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সলিল সে পথে হাঁটতে চান নি। যে বামপন্থায় তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তা তাঁর কাছে অটুট ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত। তাই বামপন্থীদের আদর্শচ্যুত হতে দেখে কষ্ট পেয়েছেন। নিজের মত করে তাঁর গানে বলতে চেয়েছেন অনেক কিছু। জানি না তা মানুষ বুঝতে পেরেছিল কি না।

সলিল হওয়ার নেপথ্যে

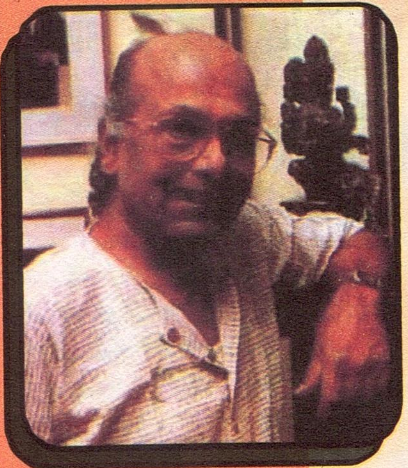

প্রথমেই বলে রাখি তরুণ বয়সে সলিল অসাধারণ গাইতে পারতেন। মাত্র আট বছর বয়সেই দুর্দান্ত বাঁশি বাজাতে পারতেন। বাবার কোনোভাবেই সমঝোতা না করার মানসিকতা তাঁর মধ্যেও ছিল। মাঝে মাঝেই সলিল গল্প করতে করতে বলে ফেলতেন তাঁর বাবার চরিত্রের দৃঢ়তার কথা। আসামের এক চা-বাগানে এক ইংরাজ কোম্পানীতে ডাক্তারের চাকরী করতেন তিনি। চাকরী করার সময় কোনো এক ইংরাজ ম্যানেজার তাঁকে ডার্টি নিগার বলেছিলেন। এর ফল অবশ্য সেই ম্যানেজারকে হাতে হাতেই পেতে হয়েছিল। সেই ম্যানেজারকে মুখ পেতে নিতে হয়েছিল সলিলের বাবার একটি বিশাল বিরাশি সিক্কার ঘুঁসি এবং হারাতে হয়েছিল সামনের সারির বেশ কয়েকটি দাঁত। আর এর ফলে বিরক্ত সলিলের বাবা চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন। সেই সময় সলিল বয়সে সদ্য যুবক। সলিলরা আট ভাই-বোন। বাবা ইস্তফা দেওয়ার ফলে হাতে পান সামান্য কিছু টাকা। তাই দিয়ে সেই সময়ে তাঁদের এত বড় সংসার চালানো ভীষণ কষ্টকর ছিল। বড় ভাই বিবাহিত ছিলেন এবং লামডিঙে রেলে চাকরী করতেন। ফলে তিনি যে সলিলদের পরিবারে আলাদা কিছু সাহায্য করবেন সেটাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর মধ্যে সলিলের বাবা হঠাৎ মারা যান। এবং স্পস্টতই পুরো সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে সলিলের কাঁধে। সলিল এই দুর্বিসহ সময় সম্পর্কে বলেছিলেন, 'কেন যে মানুষ বিপ্লবের স্বপ্ন চোখ থেকে মুছে ফেলে তার কারণ ঐ সময়ে আমি খুব হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম'। অসহনীয় অভাব আর কষ্টের সঙ্গে লড়াই করা যে কি কঠিন কাজ তা যে না করেছে সে কোনোদিনই বুঝতে পারবে না। সলিল বাধ্য হলেন তাঁর প্রতিভাকে দাঁড়িপাল্লায় তুলতে। খিদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে একসময় তাঁকে গান গেয়েও পয়সা রোজগার করতে হয়েছিল। তবে এই বিশাল অভিজ্ঞতা তাঁকে আজীবন এক লড়াকু মানুষ হিসেবে পরিচিত করেছিল। তাঁর হাত দিয়েই বলতে গেলে তৈরি হয়েছিল সর্বহারার প্রতিবাদের গান 'গণসঙ্গীত'। আর এটাও ঠিক এই কঠিন ভিতের ওপরে নির্ভর করেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তাঁর নিজের সাম্রাজ্য, যা আর কেউ পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। মনে রাখবেন, তাঁর এই জ্বালাময়ী গানই কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁর জমি ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল। বহু মানুষ তাঁর এই সব গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলা আধুনিক গানের সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিয়েছিলেন তিনি। সলিলের গান শুনে এতদিনকার ভেতো বাঙালী চমকে উঠল। কারণ, এতদিন ধরে শুনে আসা সেসব গানের সঙ্গে সলিলের গানের কোনো মিল নেই। সলিল মানেই নতুন ধরনের গান, কথায়, মেলোডিতে বা মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টে এসব গান একেবারেই আলাদা। মানুষের মনের কথা এত সহজভাবে এর আগে কেউ বলেন নি। সলিলের গান বাঙালীকে চিনিয়ে দিল সে কে? আজো বাঙালী সলিলের গানে এমনভাবে মজে আছে যে তাকে সেখান থেকে টেনে বার করা খুব কঠিন। শুনতে অদ্ভুত লাগবে, এখনকার নতুন প্রজন্মও সলিল পেলে অনেক কিছুই ছাড়তে রাজী আছে। সলিল জাগিয়ে তুলেছিল এক ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে। আর এটা সম্ভব হয়েছিল মানুষটার নাম সলিল বলেই।

> 'আমি দেখতে চেয়েছিলাম আমার সুর সবার জন্যে কি না। তাই বিভিন্ন সুরকে এক সুরে গেঁথে এমন একটা কিছু করতে চেয়েছিলাম যা সব মানুষ সব সময় পছন্দ করবেন। আমার চেষ্টা সার্থক কি না তা আপনারাই বলতে পারবেন।'

প্রথম হিন্দী সিনেমায় সঙ্গীতপরিচালক হিসেবে কাজ করা

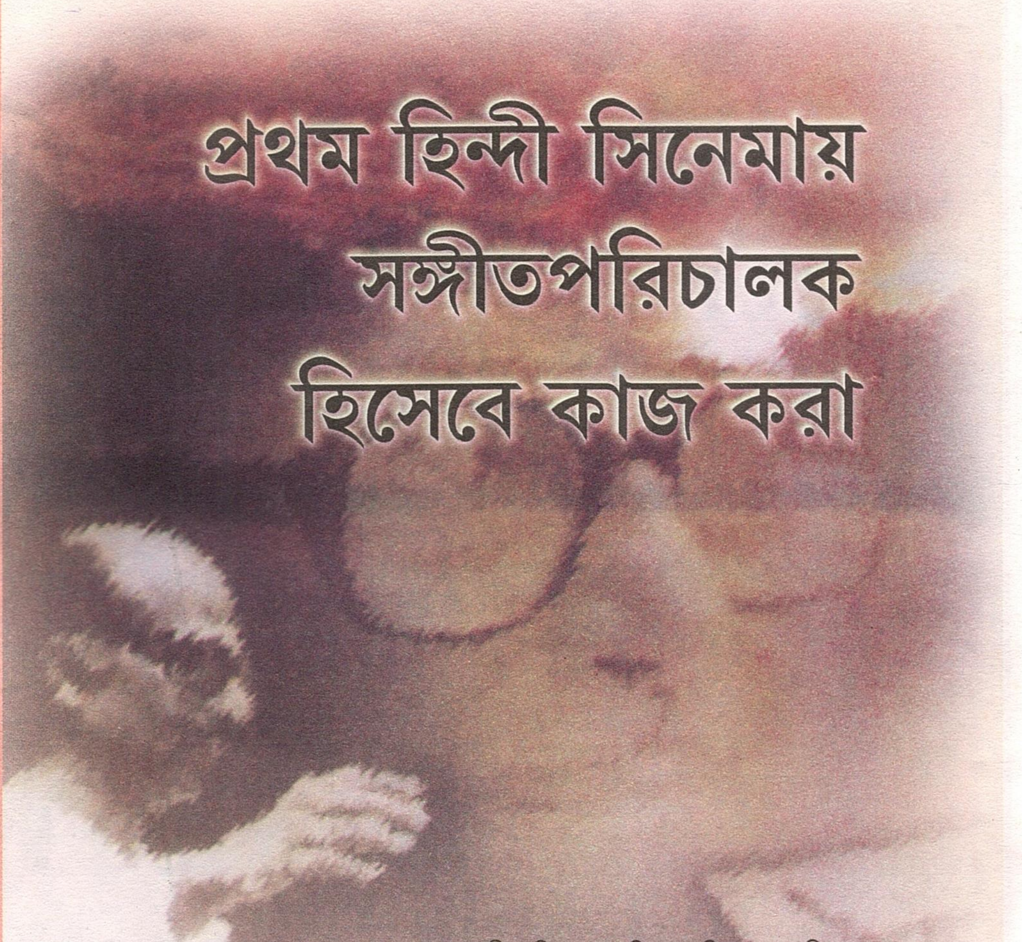

> আমি জানি না, ফিল্মের জন্য কি কি দরকার হয়, গল্প, গান না অভিনয়। কিন্তু আমি এটুকু জানি আমাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিকঠাক করতে হবে। আমি শুধু তাই করে গেছি এবং অবশ্যই সেখানে কোনো ফাঁকি দিই নি আমি।

হিন্দী ফিল্ম জগতে ডাক এল ১৯৫৩ সালে। বাঙালী পরিচালক সুবিখ্যাত বিমল রায় সিনেমা করবেন। তিনি চাইছেন একটা নতুন ধরনের গল্প, আর সুরকারও চাইছেন একজন নতুনকে। সুরকার পেলেন, কিন্তু মনের মত গল্প কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। যাই হোক, সেদিনই প্রথম বিমল রায়ের অফিসে এসেছেন সলিল চৌধুরী। সলিলের সঙ্গে প্রথম আলাপেই জমিয়ে ফেললেন বিমলবাবু। নানা কথার পরে হঠাৎই জানতে পারেলন গানের মাঝে মাঝে কিছু গল্পও নাকি তিনি লিখে ফেলেছেন। নিছক কৌতূহলের বশে দেখতে চাইলেন সলিলের গল্প। গল্প সঙ্গেই ছিল। 'রিক্সাওয়ালা' নামে একটা ছোট গল্প। বিমলবাবুকে কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে তা দেখালেন। বিমলবাবু বেশ কিছুটা আগ্রহ নিয়ে কয়েক লাইন পড়েও ফেললেন। তারপর? তারপর আর কি? বিমলবাবু পেয়ে গেলেন তাঁর সেই না খুঁজে পাওয়া বিষয়কে। বিমল রায়ের সেই সাড়া জাগানো 'দো বিঘা জমিন' সলিল চৌধুরীর ছোট গল্প রিক্সাওয়ালা অবলম্বনেই তৈরি। মনে রাখবেন, এই দো বিঘা জমিন পরবর্তী কালে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল সেরা ছবি হিসেবে, শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও এটি জিতে নিয়েছিল সেরার পুরস্কার। দো বিঘা জমিনে সলিল চৌধুরী মনপ্রাণ ঢেলে সুর দিয়েছিলেন। মীনাকুমারী এ ছবিতে ছিলেন একটি বিশেষ চরিত্রে, সেই মীনাকুমারীর লিপে যে গানটি লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন তা আজও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। **'আজা রে আজা'** এই গানটি সেসময় চমকে দিয়েছিল পুরো বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে। এছাড়াও আরো দুটি গান ছিল **'হরিয়ালা শাওন ঢোল বাজাতা আয়া'** ও **'ধরতি কহে পুকারকে'**, এর মধ্যে একটি গান রাশিয়ান রেড মার্চ থেকে নেওয়া। মনেপ্রাণে বামপন্থায় বিশ্বাসী সলিল তাঁর বিশ্বাসকে এই ছবির সুরে পরতে পরতে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ দুটো গানই ছিল কোরাস গান, লিড দিয়েছিলেন আর এক কিংবদন্তী মান্না দে। গান দুটি শুনলে বুঝতেই পারবেন সলিল তাঁর 'বিশ্বাস'কে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

সলিল চৌধুরী ও বলিউড

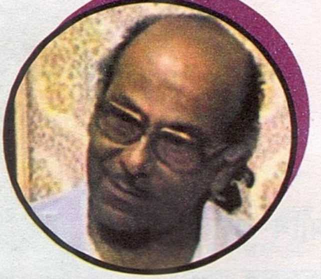

সলিল যখন বোম্বে এলেন তখন তাঁর চোখে একরাশ স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি এখানে গড়ে তুলেছিলেন **'বোম্বে ইউথ কয়ার'**। দো বিঘা জমিনে সলিল এক সটে বল পাঠালেন মাঠের বাইরে। দুর্দান্ত হিট করল বিমল রায়ের ছবি। নাম পেলেন সলিলও। তারপর একে একে করলেন **'বিরাজ বহু'** থেকে শুরু করে **'চাঁদ আউর সুরজ'**। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে করলেন ৩০টা ছবি। এর মাঝে করেছেন ১১টা বাংলা ছবি ও **'শুনবাই'** নামে একটা মারাঠি ছবি। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর জীবনে ঘটে গেছে বেশ কিছু ঘটনা। সব জায়গাতেই এক অবস্থা। কিছু লোক আছেন যাঁরা প্রথা ভেঙে বেরোতে চান, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই চান নিরাপদ গন্ডির মধ্যে থাকতে। **মধুমতী** সুপারহীট হওয়ার পর বেশ কয়েকজন পরিচালক তাঁকে দিয়ে মধুমতীর মতো সুর করাতে চাইলেন, কিন্তু সলিল তা মানতে রাজী হলেন না। তিনি চান নতুন কিছু করতে। অন্য সব সঙ্গীত পরিচালকরা যে ভাবে কাজ করতেন, সলিল চৌধুরী সেভাবে করতেন না। সাধারণত প্রথমে গান লেখা হত, তারপর সেই গান যেত সঙ্গীত পরিচালকের কাছে। তিনি সেই লেখা গানের ওপর সুর করতেন। কিন্তু সলিল চৌধুরী করতেন একেবারে উল্টোদিক দিয়ে। তিনি আগে সুর তৈরি করতেন। পরে সেই সুর অনুযায়ী গান লিখতেন। ক্রমশ নানারকম আবদারে সলিল বুঝতে পারলেন এঁরা তাঁকে তাঁর মত করে কাজ করতে দেবেন না। প্রায় ঠিক করে ফেললেন পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় ফিরে যাবেন। এমন সময় তাঁর কাছে মালয়ালাম একটি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করার জন্য অফার এলো। তিনি ভাবলেন দেখাই যাক না এই ছবিতে কাজ করে। **'চেমিন'** বলে একটি মালয়ালাম ছবিতে তিনি মনের মত করে সুর দিলেন। ছবিটি দুর্দান্ত হীট করল। সলিলও আবার বাঁধা পড়ে গেলেন। চেমিন ছবির সাফল্যের খবর বোম্বাইতে এসেও পৌঁছল। আবার সবাই দৌড়লেন সলিলের কাছে। কিন্তু আবার সেই এক সমস্যা। হাঁপিয়ে উঠলেন সলিল। সাতের দশকে তিনি লক্ষ্য করলেন মানুষের রুচি পাল্টাতে শুরু করেছে। শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যই ছবি তৈরি এই মানসিকতার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তাঁর নিজের নীতিবোধ তাঁর কাজের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। শেষমেশ ১৯৭০ সালে তিনি ঠিক করে ফেললেন, আর নয়, এবার কোলকাতাতেই ফিরে যাবেন। ফিরেও এলেন। যদিও তারপর আরো অনেক হিন্দী বা অন্য ভাষার ছবিতে তিনি সুর দিয়েছেন কিন্তু তা তিনি করেছেন শুধু মাত্র বিশেষ কিছু অনুরোধে। যে যশ ও অর্থের মিনারে তিনি পৌঁছে ছিলেন তা হেলায় ঠেলে ফেলে চলে এলেন এই কোলকাতায়।

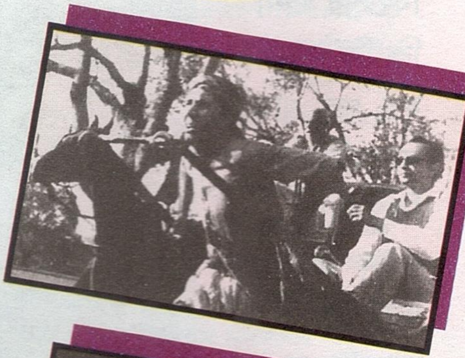

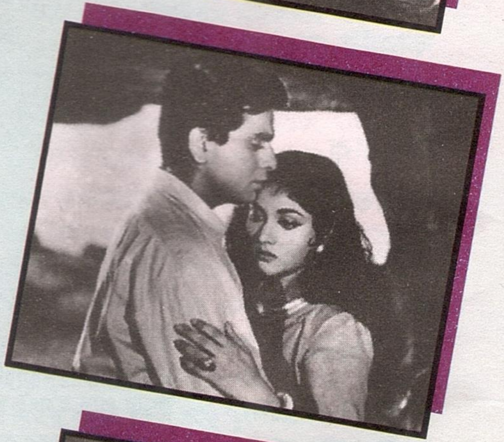

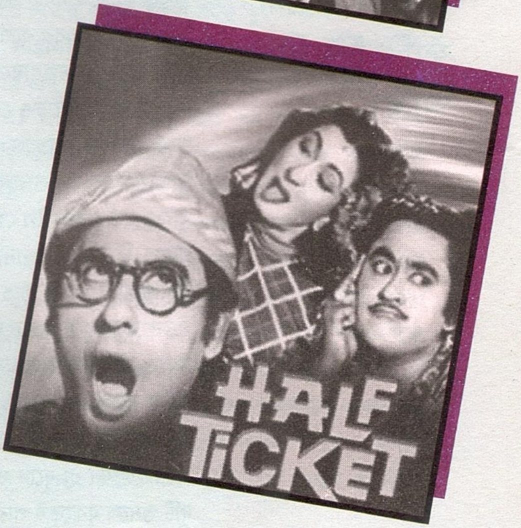

'মধুমতী'
চেনাল আর এক সলিলকে

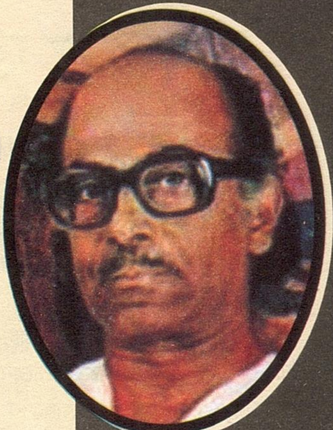

১৯৫৮তে বিমল রায়ের মধুমতী রিলিজ হয়। এই ছবিতে গান শুনে বলিউড আরো একবার চমকে ওঠে। এতোদিন ধরে তাদের ধারনা হয়েছিল সলিল মানেই বামপন্থার গান। মধুমতীর গান সেসব ধারনাকে ধুয়েমুছে সাফ করে দিল। আসল হীরে বেড়িয়ে এল ঝকমক করে। ছবির শুরুতেই এক পাহাড়ী পরিবেশে ছবির নায়ক দিলীপকুমার যখন গেয়ে ওঠেন 'সুহানা সফর', দর্শক ভাবতে শুরু করেন এ গান কার তৈরী? তারপর একে একে বের হয় আরো বিস্ময়, 'আজা রে পরদেশী' থেকে 'টুটে হুয়ে খোয়াবোঁ', সব গানই মানুষের মনের একেবারে ভেতরে গিয়ে ধাক্কা মারে। এমন কি জনি ওয়াকারের লিপে 'জঙ্গল মে মোর নাচে'র মত হাল্কা গানেও রয়েছে পেশাদারিত্বের ছোঁয়া। কোথাও বাংলার আইপিটিএ ফেরতের লেশমাত্র ছোঁয়া নেই। গানগুলো আসাধারণ গেয়েছিলেন মুকেশ এবং মহম্মদ রফি। সেই সময় রেডিও সিলোনে একটা অনুষ্ঠান হত, দশটা সেরা গান নিয়ে। সব থেকে মজার কথা হল, সেই রেডিও সিলোনে সপ্তাহর পর সপ্তাহ দশটা গানের মধ্যে সাতটা গানই থাকত মধুমতীর। বুঝে দেখুন, সেইসময় সলিল যাদুতে সারা দেশ কিভাবে মজে ছিল। সলিল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শুধু লড়াইয়ের গান নয়, প্রেম থেকে বিরহ সব গানেই তিনি সমান সাবলীল ছিলেন।

'আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আমার কাছে সঙ্গীত জগৎ মনে হয়েছিল এক বিশাল উঁচু হিমালয়ের মত। আর আজ, এই সময়ে আমি দেখলাম তা এখনও সেই হিমালয়ের মত উঁচু হয়েই আছে।'

হিন্দী গানে বাংলা সুর

১৯৬০ সালে **পরখ** ছবিতে সলিল চৌধুরী লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাওয়ালেন দুটি গান, **'ও সজনা বরখা বাহার আয়ে'** এবং **'ইয়ে বাঁশি কিঁউ গায়ে'**। দুটো গানই লতার গাওয়া দুটি বাংলা গানের সুর থেকে নেওয়া। সে দুটো গানের সুরকারও ছিলেন সলিল চৌধুরী। সেই বাংলা গান দুটি হল **'না যে না'** ও **'ও বাঁশি কেন গায়'**। বাংলায় গানদুটি সুপারহীট ছিল। সলিল কি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন হিন্দী বলয় এই সুর দুটিকে নেয় কি না তা দেখতে? হয়ত তাই। আর সত্যি বলতে কি গান দুটি সুপার ডুপার হীট করে। আজও লতার বেস্ট একশোটা গানের মধ্যে প্রথম দশের মধ্যে এ গান দুটো আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। পরিচালক বিমল রায়ের পুরো ভরসা ছিল সলিলের ওপর, কোনোক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা দেন নি। মনের সুখে সুর করতে দিয়েছিলেন সলিলকে। সলিলও তাঁকে নিরাশ করেন নি। একের পর এক দিয়ে গেছেন অসাধারণ সব গান যা আজও ভারতীয় সঙ্গীত জগতের সম্পদ বলেই গণ্য হবে। ১৯৭০ এ হৃষিকেশ মুখার্জীর **'আনন্দ'** মুক্তি পায়। মুকেশ এছবিতে গাইলেন এক অসাধারণ গান **'ম্যায়নে তেরে লিয়ে হি সাত রং কে স্বপনে চুনে'**। সারা ভারত হতবাক হয়ে গেল, মুকেশ এ গান গাইলেন কি করে? এতদিন মুকেশ সম্পর্কে সবার ধারনা ছিল কিছু কিছু গান মুকেশ গাইতেই পারেন, কিন্তু সব গান মুকেশের জন্য নয়। সেই ধারনাটাই পুরো বদলে দিলেন সলিল। পুরো ছবিটাকে এক অসাধারণ সুরে বেঁধে রেখেছিলেন সলিল, যে বাঁধন থেকে দর্শকদের বেরোনোর কোনো রাস্তা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি আজও কি আমরা সলিল থেকে বেরোতে পেরেছি?

ছবির আবহ সঙ্গীতে সলিল

সম্ভবত সলিল চৌধুরীই প্রথম মানুষ যিনি কোনো ছবিতে গানের সুর দেন নি কিন্তু ছবিটির পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তাঁর করা। **১৯৫৫ সালে বিমল রায় করলেন দেবদাস।** এ ছবি করার সময় হয়ত সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি ভরসা করতে পারেন নি সলিলের ওপর। হয়ত ভেবেছিলেন এই রকম একটা ক্লাসিক ছবিতে সলিল বোধহয় ঠিক মত পেরে উঠবে না। তাই তিনি এই ছবিতে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব দিলেন সুবিখ্যাত শচীনদেব বর্মণকে। কিন্তু সলিলকেও ছাড়লেন না। সুযোগ দিতে চাইলেন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে। সেই সময় এরকম হত না। ছবির মিউজিক ডিরেক্টরই সব দিক সামলাতেন। বিমল রায় সলিলকে বললেন, **'সলিল, এ ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা তুমি করবে?'** সলিল চৌধুরী দু মিনিট ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ করবো'। আসলে এটাকে তিনি নিয়েছিলেন একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে। এখানেও তিনি পেলেন চরম সফলতা। বলিউড আবারো বিষ্মিত হল। এ ব্যাপারে সলিল নিজেই বলেছেন - 'একদিন রাত প্রায় দুটো হবে। হঠাৎ আমার বাড়ীর কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি, বিমলদা, হৃষিকেশ এবং শচিনকর্তা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। বিমলদা বললেন, তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা করবে? শচিনকর্তাও আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি বিমলদার কথা কোনোদিন ফেলতে পারি নি। রাজী হয়ে গেলাম। পরে জানতে পারলাম বিমলদা শচিনকর্তার করা শেষ চার রিল ব্যাকগ্রাউন্ড শুনে খুশি হতে পারেন নি।' অনেক পরে নাকি বিমল রায় বলেছিলেন, 'আমি ভুল করেছি, সলিলের ক্ষমতাকে ছোট ভাবা আমার ঠিক হয় নি'। ১৯৬০ সালে ডাক পেলেন বি আর চোপড়ার কাছ থেকে। ছবিতে কোনো গান নেই। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের দায়িত্ব তিনি তুলে দিলেন সলিলের হাতে। যাঁরা **'কানুন'** দেখেছেন তাঁরা বুঝতেই পারছেন কি অসাধ্য সাধন সলিল চৌধুরী করেছিলেন। এখানেও একটা গল্প আছে। বি আর চোপড়ার বরাবরের মিউজিক ডিরেক্টর হলেন রবি। তা সত্ত্বেও তিনি সলিল চৌধুরীকে কেন ডাকলেন ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য? তার কারণ হল বি আর চোপড়া ফিল্মস ডিভিশনের একাধিক ডকুমেন্টারী যেমন

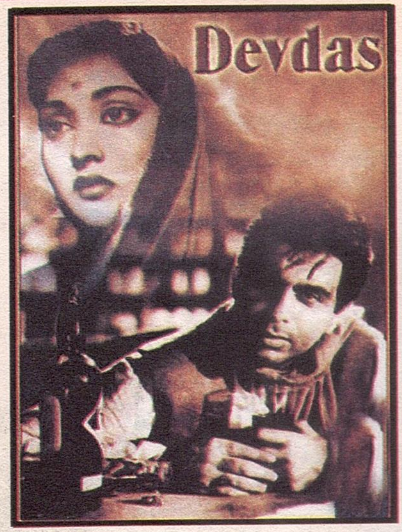

'গৌতম বুদ্ধ' বা 'ইন্দাস ভ্যালি টু ইন্দিরা গান্ধী' প্রভৃতিতে সলিলের করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকগুলো শুনে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি বুঝতে পারেন কানুনের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কেউ করতে পারে সে একমাত্র সলিলই। এ ব্যাপারে বি আর চোপড়া একসময় বলেছিলেন, 'আমাকে অনেকেই অন্য অনেকের নাম বলেছিলেন। কিন্তু আমি ঠিক করি যে সলিলদাই একাজ করবেন। কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ওপর ফিল্মের অনেক কিছুই নির্ভর করে. যা আমার মতে সলিলদা ছাড়া কেউ করতে পারবে না। কানুন বেরোনোর পর বোঝা গেছিল আমি ঠিক লোককেই সিলেক্ট করেছিলাম।' এর পর বহু ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে সলিল চৌধুরী কাজ করেছেন এবং প্রতিটাতেই রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার সাক্ষর। ফিল্মস ডিভিশনের বহু ডকুমেন্টারী ফিল্মের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তাঁরই করা। আনোখি রাতে মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন রোশন। তাঁর মৃত্যুর পর সলিল চৌধুরী ব্যাকগ্রাউন্ডের বাকি কাজটা করেন। **কালা পাথরের** মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন রাজেশ রোশন। গানের সুর রাজেশই দিয়েছিলেন কিন্তু ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ করেছিলেন সলিল চৌধুরী। **'চেহরা পে চেহরা'**র ক্ষেত্রেও একই কাজ করেছিলেন সলিল, গানে সুর দিয়েছিলেন এন দত্ত। হৃষিকেশ মুখার্জীর **'নোকরি'** ছবির গল্প এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে সলিলের, গানের সুর দিয়েছিলেন রাহুল দেববর্মণ। গুলজারের **'মৌসম'** ছবির মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন মদন মোহন, তাঁর মৃত্যুর পর সলিল ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ করেছিলেন। **'দীপ'**, **'অভয়ম'** ও **'ভেলাম'** এই তিনটে মালয়ালাম ছবি এবং **'উইর'** তামিল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডও সলিলের করা। সলিল চৌধুরী সম্পর্কে বিখ্যাত গায়ক কে জে যেশুদাস বলেছিলেন, 'আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার কম্পোজিশন শোনার। পিয়ানোর সামনে তন্ময় হয়ে উনি ফুটিয়ে তুলছেন একের পর এক স্বর্গীয় সব সুর মূর্ছনা। আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সব শুনে চলেছি। সত্যি কথা বলতে কি সংগীত যে এমন স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দিতে পারে তা আমি অন্য কারোর কাছ থেকে পাই নি'।

অন্যান্য যাঁরা সলিলের সুরে গেয়েছেন

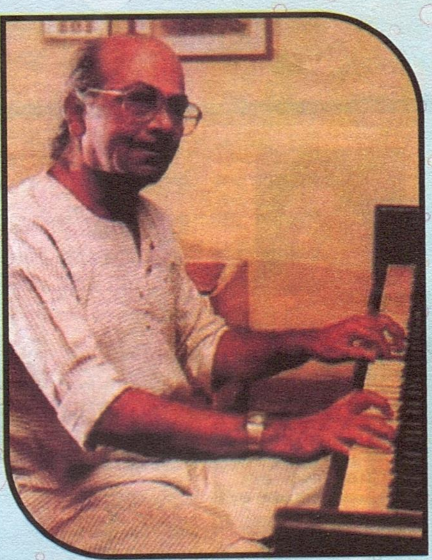

ভারতের প্রায় সব গায়ক-গায়িকাই সলিলের সুরে গেয়েছেন। তাঁদের পুরো ইতিহাস বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তাই তাঁদের কথা শুধু একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব। কিশোরকুমার অনেক গানই গেয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটি হল নোকরি ছবিতে 'আরজি হামারি', হাফটিকিটে 'আরে লে লো' বা 'আ রহে থে'। মহম্মদ রফি গেয়েছেন ছায়া'তে লতার সঙ্গে 'তসবির তেরি দিল মে' বা মধুমতীতে 'জঙ্গল মে মোর নাচা'। মান্না দে গেয়েছেন পরখ ছবিতে 'ক্যায়া হাওয়া চলিরে বাবা' বা কাবুলীওয়ালায় 'অ্যায় মেরে প্যায়ারে বতন'।

তালাত মামুদ ছায়া'তে গেয়েছেন 'ইতনা মুঝছে তু। আশা গেয়েছেন আমানত ছবিতে 'মেরে ওয়াফায়ি' বা মধুমতীতে 'কাঞ্চা রে কাঞ্চি রে'। শৈলেন্দ্র লতার সঙ্গে গেয়েছেন পরখ ছবিতে 'মিলা হ্যায় কিসিকা ঝুমকা'। সুমন কল্যাণপুর রফির সঙ্গে চাঁদ আউর সুরযে গেয়েছেন 'তুমহে দিল সে'। যেশু দাস কুয়াশায় গেয়েছেন 'জানে রাজ'। হরিহরণ চেমিন লেহরে-তে গেয়েছেন 'লেহের লেহের দোলে'। বাণী জয়রাম দায়সিতে গেয়েছেন 'ভূমি নাচ রহি আজ'। কবিতা কৃষ্ণমূর্তি গেয়েছেন 'মেরা দমদে আয়েনা অ্যায়সা', ঐ একই ছবিতে অনুরাধা পাড়োয়াল গেয়েছেন 'ঘির ঘির বরষে' এবং জলি মুখার্জী গেয়েছেন 'যব ম্যায়। অপরাধী কৌনে গীতা দত্ত মান্না দের সঙ্গে গেয়েছেন 'হ্যাঁয় প্যার কে'। এছাড়াও সলিলের সুরে আরো যাঁরা গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন – উৎপলা সেন (আমার কিছু মনের আশা), হীরালাল সরখেল (বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর), বাণী ঘোষাল (ইস্কাবনের দেশে), প্রতীমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘুম আয় রে আয়), শচীন গুপ্ত (এবার আমি আমার থেকে), মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যদি জানতে, ও তুমি জানতে), জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (পাগল হাওয়া), বিষ্ণুপদ দাস (ভাঙ্গা ঘরে ও বরষা), নির্মলা মিশ্র (এ মন মোরে জানে না), হৈমন্তী শুক্লা (ভালবাসি বলে ভালবাসি বলি না), কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় (কাছে থেকে ভুলে গেছে), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (ঝন না ঝন না), নির্মলেন্দু চৌধুরী (হায় হায় কি হেরিলাম), বিশ্বজিৎ (যায় যায় দিন), তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এসো কাছে বসো), পিন্টু ভট্টাচার্য (ওগো আমার কুন্তলিনী প্রিয়ে), অনুপ ঘোষাল (এমনি চিরদিন তো কভু যায় না), রাণু মুখার্জী (কুহেলী রাত একা একা), উষা মঙ্গেশকর (দূরে প্রান্তরে), সলিল চৌধুরী (এ রোকো পৃথিবীর গাড়ীটা থামাও), সাগর সেন (এ জীবন এমনি করে), বনশ্রী সেনগুপ্ত (এই তো ফের এলাম), উষা উত্থুপ (এই হাসি এই গান)। এছাড়াও আরো অনেকে সলিলের সুরে গেয়েছেন।

অন্যান্য যাঁরা সলিলের সুরে গেয়েছেন

লতা ও সলিল

সোজা কথায় বলতে গেলে সলিলই লতা মঙ্গেশকরকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলন। লতা আর সলিল বাংলা আধুনিক গানের

ধারাটাই পাল্টে দিয়েছিলেন। মনের সুখে সলিল গান লিখেছেন, সুর বসিয়েছেন আর সেইসব গানকে প্রাণ দিয়ে গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। **'না যেও না'** থেকে শুরু করে **'যা রে যা উড়ে যারে পাখি'** সব গানই এক কথায় সুপারহিট। বহুদিন পরে বাঙালী পেল এক অসাধারণ যুগলবন্দী। আজও এসব গান শুনলে মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এভাবে মনে সাড়া ফেলা গান বহুদিন বাঙালী পায় নি। তবে একেবারে শেষের দিকে, কোলকাতায় ফিরে এসে সলিল আবারও চেষ্টা করেছিলেন লতাকে দিয়ে আবার একটা ঝড় তুলতে। কিন্তু সেটা আর পারেন নি তিনি। কারণ ১৯৮৮তে শেষ যে এলপিটা তাঁরা বার করেছিলেন তাতে ছিল মোট আটটা গান। এর মধ্যে মাত্র দুটো ছিল নতুন বাদবাকি ছটা গানই আগেকার সুরেরই রিমেক। এর মধ্যে সন্ধ্যা মুখার্জীর গাওয়া দুটো গানের সুরে লতাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন, যার মধ্যে লতার গাওয়া **'সবার আড়ালে'** আসলে সন্ধ্যার গাওয়া **'গুরু গুরু মেঘ গরজে'**রই সুরে করা। এছাড়াও সন্ধ্যার **'কিছু আর কহিব না'**-র সুরেই লতাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'ভুলো না প্রথম সেই দিন' গানটি। সুবীর সেনের চিরস্মরণীয় **'ধরণীর পথে পথে'** অহেতুক লতাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। এছাড়াও হেমন্তর গাওয়া বহু প্রচলিত **'রানার'** গানটিও লতাকে গাইতে দিয়েছিলেন। হয়ত তিনি একটা মাস্টারস্ট্রোক দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা শ্রোতারা নেয় নি। ফলে সলিল চৌধুরী আরো কিছুটা পিছিয়ে পড়েন।

সলিল ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

পাঁচের দশকের শুরুতে সলিল সন্ধ্যাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন **'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা'**, **'প্রান্তরেরও গান আমার'**, **'উজ্বল এক ঝাঁক পায়রা'** ও **'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে'**। শুরুটা এভাবেই

হয়েছিল। সব মিলিয়ে গোটা পনেরো গান সন্ধ্যাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। সন্ধ্যার মত শিল্পীকে দিয়ে কেন এত কম গান ? এর উত্তর কিন্তু কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে আবার বেশ কয়েকটি গান শুধুমাত্র রেডিওর জন্যই করা হয়। যেমন **'গোধুলীর শান্ত ছায়ায়'**, **'কে যে পথের মাঝে'** বা **'গুরু গুরু গুরু মেঘ গরজে'**। এ গানগুলো শুধুমাত্র রেডিওতে 'এ মাসের গানে'র জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ব্যবসায়িকভাবে কোনোদিনই এগুলো সাধারণ শ্রোতাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি। ১৯৭৩ সালে **'ও নীল নীল পাখী'** এই গানটিই শেষবার সন্ধ্যাকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল। পরে এই গানটি অন্য দুটি ভাষাতেও করানো হয়েছিল, একটি গুজরাটি ভাষায় **'ঘর-সংসার'** ছবির জন্য, আর অন্যটি ওড়িয়া ভাষায় **'বাতাসি ঝরা'** ছবির জন্য। এখানে আর একটি কথা বলে রাখি। বিখ্যাত কণিকা

বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েও **'প্রান্তরেরও গান আমার'** গাইয়েছিলেন সলিল কিন্তু বিশ্ব ভারতী কণিকাকে অরবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে অনুমতি না দেওয়ায় এই গানটি আজ পর্যন্ত শ্রোতাদের হাতে আসে নি। পরে উৎপলা সেনও এই গানটি করেছিলেন।

সলিল ও সুবীর সেন

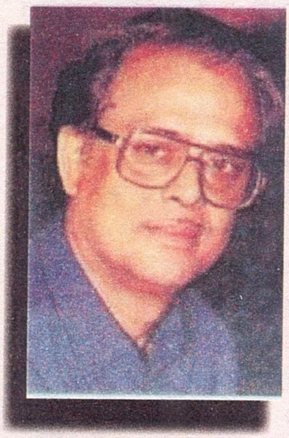

গলার সঙ্গে হেমন্তর মিল থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় সুবীর সেন একেবারেই আলাদা মাত্রার শিল্পী ছিলেন। সুবীর ও সলিল মিলে মোট দশখানি গান তৈরি করেছিলেন এবং প্রত্যেকটাকেই দুর্দান্তভাবে মানুষ নিয়েছিল। অনেক পরে সুবীরের গাওয়া **'ধরণীর পথে পথে'** লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাইয়েছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা সুবীরের জায়গায় লতাকে মেনে নিতে রাজী হন নি। সুবীর সেন সম্পর্কে একটা না জানা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি। সুবীর **'মিডনাইট'** বলে একটি ছবিতে সুর দিয়েছিলেন। ছবিটি ইংল্যান্ডে মুক্তি পায় ১৯৭০ সালে। এই ছবিতে গীতা দত্ত, রফি, আশা ভোঁসলে এবং সুবীর নিজে বেশ কিছু গান গেয়েছিলেন।

দ্বিজেন ও সলিল

দ্বিজেনের সঙ্গে সলিলের পরিচয় চারের দশকে। দুজনে একসাথে তখন আইপিটিএ করতেন। হেমন্তর সঙ্গেও সেখানেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব। হেমন্তর গলার প্রতি বোধহয় সলিলের একটা দুর্বলতা বরাবরি ছিল, তা না হলে বার বার তিনি কেন যাঁদের সঙ্গে হেমন্তর গলার মিল ছিল তাঁদের খুঁজে বার করেছেন। দ্বিজেনের গলার সঙ্গেও হেমন্তর বেশ মিল আছে। দ্বিজেনের সবচেয়ে হিট যে গানটি সলিলের সুরে মানুষের মন মাত করে দিয়েছিল সে গানটি হল 'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা'। এই গানটি সন্ধ্যাকে দিয়েও গাইয়েছিলেন সলিল। **'ক্লান্তি নামে গো'** গানটিও অসাধারণ। দ্বিজেনের গলায় আরো যে সব হিট গান সলিল তুলে দিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে **'একদিন ফিরে যাব চলে'** বা **'পল্লবিনী গো সঞ্চারিনী'**র মত গান। এছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুটি অসাধারণ কবিতায় সুর দিয়ে দ্বিজেনকে দিয়েছিলেন গাইবার জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, দ্বিজেন সলিলকে নিরাশ করেন নি। কবিতা দুটি হল **'রেখো মা দাসেরে মনে'** এবং **'আশার ছলনে ভুলি'**। আটের দশকের প্রথম দিকে তিনি আবারও দ্বিজেনকে দিয়ে **'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা'** গানটি গাইয়েছিলেন তবে সেটি প্রথম গাওয়া গানটির জায়গা একেবারেই নিতে পারে নি। দ্বিজেন সলিলের সুরে গেয়েছেন প্রায় ৪৮টি গান।

শ্যামল ও সলিল

শ্যামল মিত্র নিজেও একজন সফল সুরকার, তবুও সলিল শ্যামলকে দিয়ে গাইয়েছেন ৮টি গান। শ্যামলের গাওয়া প্রতিটি গানই মনে দাগ কাটার মত। এর মধ্যে রয়েছে **'আঁকা বাঁকা যে পথ'**, **'যা যারে যা পাখী'** বা **'যদি কিছু আমারে শুধাও'**-য়ের মত। শ্যামল মিত্র-র গলা ছিল অসাধারণ, কিছুটা ন্যাজাল টোনের জন্য গলাটাকে আরো রহস্যময় মনে হত। এখানে আরো একটা কথা বলে রাখি, দেবব্রত বিশ্বাস আলাদাভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া যেসব গান গেয়েছিলেন তার মধ্যে **'যদি কিছু আমারে শুধাও'** গানটিও ছিল। দেবব্রত বিশ্বাস এই গানটিকে তাঁর ভরাট গলা দিয়ে একেবারে আমাদের মরমে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আজও গানটি শুনলে একমনেই শুনতে হবে।

সবিতা চৌধুরী ও সলিল সবিতা

তাঁর প্রথম যে গানটি রেকর্ড করেন তা সলিলেরই। ব্যক্তিগত জীবনে সলিলের সহধর্মিনী হলেও সবিতা কিন্তু আলাদা ভাবে অনেক ছবিতে গান গেয়েছেন। সবিতার দ্বিতীয় গানের রেকর্ড নচিকেতা ঘোষের সুরে। কেউ কেউ হয়ত ভেবে থাকতে পারেন সলিলের জন্যই সবিতা উঠেছেন। ভাবনাটা কিন্তু একেবারেই ভুল। সবিতা

গান গেয়েছেন সম্পূর্ণভাবে নিজের ক্ষমতায়। সলিলকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে দিয়ে গান গাওয়াতে। সলিল সবিতাকে দিয়ে যত না বাংলা গান করিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গাইয়েছেন অন্যান্য ভাষার গান। সবিতা সলিলের সুরে গেয়েছেন হিন্দী, তামিল, অসমিয়া, ওড়িয়া এমন কি কন্নড়েও। বরং একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে সলিলের ভারে সবিতা কিছুটা চাপা পড়ে গেছিলেন।

অন্তরা ও সলিল

সম্পর্কের দিক দিয়ে অন্তরা সলিলেরই মেয়ে। অন্তরার গলা সত্যিই ভীষণ মিষ্টি, সুরেলা তো বটেই। অন্তরা ছোটবেলা থেকেই তুখোড় গায়িকা। সলিলের আর এক স্বপ্ন ছিল ছোটদের জন্য গান করা। অন্তরা সলিলের সে স্বপ্ন পুরোটাই সফল করেছিলেন। একটা সময় ঘরে ঘরে বাজত অন্তরার গান। **'ও আয়রে ছুটে আয়'** বা **'বুলবুল পাখী ময়না'** আজও বলতে গেলে ছোটদের মনের মত গান। সলিল অন্তরার কন্ঠ দিয়ে ছোটদের জন্য ২৫টা গান উপহার দিয়েছিলেন। এটা একশোভাগ সত্যি যে সলিলের সবকটা গানই অন্তরা হিট করিয়ে ছেড়েছিলেন। **'মিনু'** ছবিতে মান্না দের সঙ্গে **'তেরি গলিওঁ মে হাম আঁয়ে'** আজও সমান জনপ্রিয়। আটের দশকের শেষের দিকে সলিল এক্সপেরিমেন্টালি কিছু সুর করেছিলেন। প্রত্যেকটা গানই গুণগতভাবে দুর্দান্ত হয়েছিল, কিন্তু ঠিক মত বিপণন না করতে পারায় সেগুলো শ্রোতাদের কাছে ঠিকমত পৌঁছতে পারে নি। এই সময়ের দুটো গানের কথা বলি, শুধুমাত্র কর্ড ব্যবহার করে কিভাবে গান গাওয়া যেতে পারে তা সলিল দেখিয়ে দিয়েছিলেন, একটি গান **'এমন সঘন বরষা'** এবং অন্যটি **'ও ভোলা মন'** । কেন এই গানগুলোকে অসাধারণ বলছি তা না শুনলে বুঝতে পারবেন না। ১৯৮৫ সালে দূরদর্শনের একটি সিরিয়াল 'দর্পণে' তিনি এই গানটি ব্যবহার করেছিলেন। এই সময় সলিলের কিছু কিছু ব্যবহার খুব অদ্ভূত ধরনের মনে হয়েছিল যার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। হেমন্ত-লতা **'পরিবার'** ছবিতে একটি অসাধারণ গান গেয়েছিলেন, গানটি হল 'ঝিরঝির ঝিরঝির ভাদর বরষে'। এই গানটির সুরে অন্তরাকে দিয়ে গাওয়ালেন **'একদিন সন্ধ্যায়'** গানটি। এছাড়াও রানু মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গান **'আকাশ কুসুম দিয়ে'** গানটির কথা পাল্টে অন্তরাকে দিয়ে গাওয়ালেন **'এক পো দুধ কিনেছি'** গানটি। এই গান দুটি গাইয়ে আমার মনে হয় অন্তরার প্রতিভার প্রতি অবিচারই করেছিলেন সলিল।

সলিল এবং বাংলা ছবি

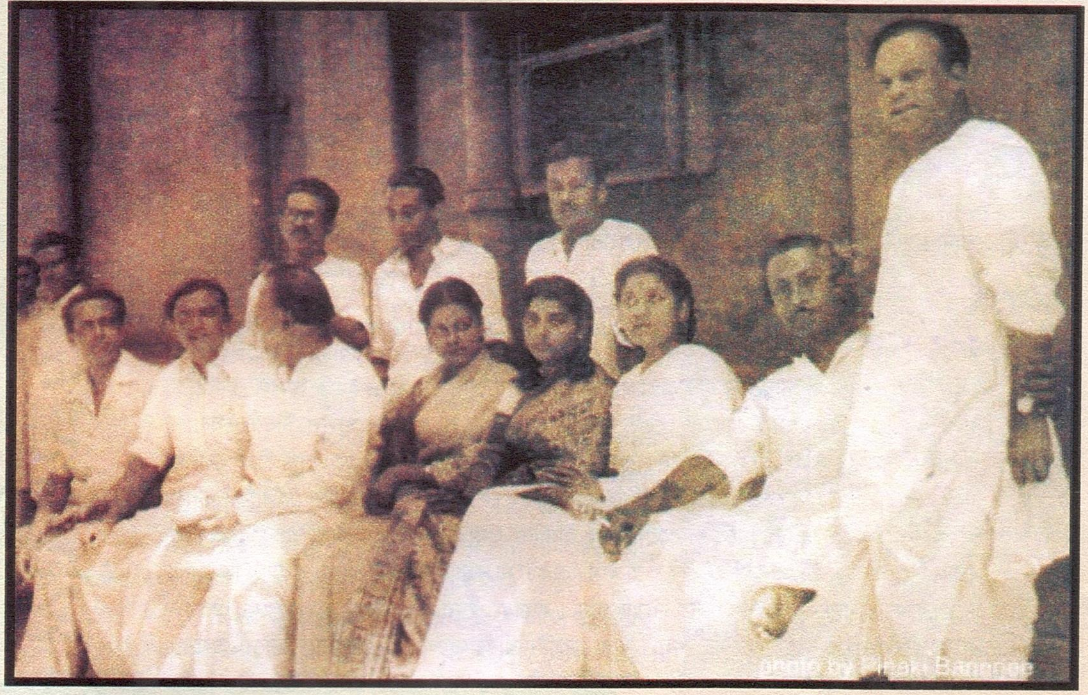

স লিলের প্রথম বাংলা ছবি পরিবর্তন। ১৯৪৯ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। তবে এর আগে সলিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের **'পুতুল নাচের ইতিকথা'**য় সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সলিল চৌধুরী ৪৫টা মত বাংলা ছবিতে কাজ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এর মধ্যে অনেক ছবিই শেষ পর্যন্ত পুরোটা তৈরি হয়ে পারে নি। প্রযোজকের টাকা ফুরিয়ে যাওয়া বা মারা যাওয়া এই রকম অনেক কারণে আর ছবিগুলি হয়ে ওঠে নি। ফলে অনেক ভাল ভাল গান অকালে হারিয়ে গেছে। **'হারানের নাতজামাই'** ছবিটি শেষ পর্যন্ত আর হলের মুখ দেখতে পায় নি। পরে যখন ক্যাসেট হিসেবে বেরোয় তখন তাতে শুধু অনুরাধা পাড়োয়ালের গাওয়া একটি গানকেই পাওয়া যায়। **'সেইসময়'** বলেও একটা ছবি অসমাপ্তভাবে শেষ হয়। এই ছবিতে সলিলের তিনটি অনবদ্য গান ছিল, যেগুলো আর পরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ১৯৯০ সালে **'আশ্রিতা'** বলে একটি ছবি মুক্তি পায়। এছবিতে হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন। গান লিখেছিলেন মুকুল দত্ত এবং সলিল চৌধুরী। সলিল চৌধুরী দুটো গান লেখেন এবং সুর দেন। এছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কাজ সলিল করেন। তবে ছবিটি আগে অন্য নামে তৈরি হতে হতে হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। পরে ছবিটি সম্পূর্ণ করে আশ্রিতা নামে মুক্তি পায়। এছবির গল্প লেখেন বাণী বসু।

সলিলের ফিল্মি কেরিয়ার

সলিল চৌধুরী সবচেয়ে বেশি ফিল্ম করেছেন হিন্দী ফিল্ম, প্রায় ৭৫-এর মত। বাংলা ছবি করেছেন ৪৫টা মত, মালয়ালাম ছবি করেছেন ২৬টা মত। এছাড়াও করেছেন বহু তামিল, তেলেগু, কন্নড়, গুজরাটি, মারাঠি, অসমিয়া বা ওড়িয়া ছবি। এসব ছবিতে কোথাও তিনি সঙ্গীত পরিচালক আবার কোথাও বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন।

গানের জগতে সলিল চৌধুরী এক আলাদা

যদি ভারতীয় সিনেমার নিরিখে বিচার করি তাহলে বলতেই হবে, এমন অসাধারণ প্রতিভা ভারতীয় সিনেমায় এর আগে কোনোদিনই আসে নি। জোর দিয়ে বলতে পারি ভবিষ্যতেও আসবে না। এতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি গানকে দেখা, পর্দায় সিচ্যুয়েশনটার সঙ্গে গান কি ভাবে যাবে তা বার বার ভাবা এবং সবার শেষে আরো নতুন কি কি বার যায় তা নিয়ে রাতের পর রাত চিন্তাভাবনা করা এখনকার এই চটজলদির দিনে কারোর কাছ থেকে আশা করাই যায় না। এখনকার যুগে সবকিছুই রেডিমিক্স। শোনার দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। ফলে বিদেশের সুর ঝাড়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে ভারতীয় ফর্মাটে ফেলে নতুন কিছু করার মত মানসিকতা কারোর মধ্যেই এখন আর নেই। সলিল চৌধুরীর তা ছিল। তা না হলে তিনি মোৎজার্ট বা বিটোফেনকে সাধারণের মাঝে বিতরণ করার সাহস দেখাতে পারতেন না। এখানেই দরকার চরম প্রতিভা, যা একমাত্র সলিল চৌধুরীরই ছিল। ছ-য়ের দশকে যখন তবলা ছাড়া কেউ গান ভাবতে পারত না, সেখানে সলিল চৌধুরী তবলাকে বাদ দেওয়ার মত সাহস দেখিয়েছিলেন। কর্ডকে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। রাজকাপুর তো বলেই দিয়েছিলেন, 'এরকম লোক আমি কোনোদিন দেখি নি। তবলা থেকে সরোদ সবই উনি বাজাতে জানতেন। শুধু বাজানো নয়, উনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন এক একটা যন্ত্রাঙ্গ দিয়ে এক একটা অনুভূতি তৈরি করা যায়। একটা না বলা কথা কত সহজে শুধুমাত্র মিউজিক দিয়ে বোঝানো যায় তা উনিই দেখিয়ে দিয়েছিলেন'। রাজকাপুরের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল **'একদিন রাত্রে'** বা **'জাগতে রহো'** করবার সময়। যাঁরা একদিন রাত্রে দেখেছেন তাঁরা ভালোভাবেই জানেন, রাজকাপুর এছবিতে গাঁয়ের একটি মানুষের চরিত্র করেছিলেন যে হঠাৎই একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনা গেঁথে পুরো ছবিটি তৈরি। পরিচালক ছিলেন শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। একেবারে শেষটুকু ছাড়া সারা ছবিতে রাজকাপুরের কোনো সংলাপ ছিল না। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে রাজকাপুরের প্রতিটি অভিব্যক্তিকে নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে চুলেছিলেন সলিল চৌধুরী। আর পরিশেষে ছিল লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া একটি অসাধারণ গান। শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'সলিল ঐ একটি গানের জন্যেই কিংবদন্তী হয়ে থাকবে। কি করে যে সলিল এমন সুর করল আমরা ভাবতেই পারি না'। প্রখ্যাত ভি বালসারা একবার বলেছিলেন, '১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কিতে আন্তর্জাতিক যুব উৎসব হয়েছিল। সলিলদা সেখানে অনুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রিত হন। উনি ওখানে বহু বাংলা গানের সুর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিলেন, পরে সেগুলো হিন্দীতে অনুবাদ করতে দেন প্রেম ধাওয়ানকে এবং গাইতে দেন সুধা মালহোত্রাকে। এই গানগুলো শোনবার সময় আমি দেখেছি প্রতিটা শ্রোতা অদ্ভুত আবেশে সে সব গান শুনছিল'। ৯০-এর প্রথম দিকে প্রায় ৫০জন গায়কগায়িকা নিয়ে দূরদর্শনের আমন্ত্রনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করেছিলেন। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল সে অনুষ্ঠান। আজও সেই অনুষ্ঠান প্রায়ই দূরদর্শনে দেখানো হয়। বাংলা তো বটেই পুরো ভারতকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরকার হিসেবে হাতেখড়ি সলিল চৌধুরীর হাত ধরেই। হৃদয়নাথের বহু গানের সুরেই তাই পাওয়া যায় সলিলের প্রভাব। এমন কি যে হেমন্ত মুখার্জী সলিলের প্রায় শতাধিক গানকে নিজের কন্ঠে রূপ দিয়েছেন। সেই হেমন্ত মুখার্জীও সুরকার হিসেবে সলিলের ছায়া এড়াতে পারেন নি। হেমন্ত মুখার্জী **'ডোলকারা ডোলকারা'** বলে একটি মারাঠি ফিল্মে সুর দিয়েছিলেন। গানগুলো শুনলে মনে হবে এ যেন সলিলেরই সুর। এরকম বহু সুরকার পরবর্তী আমলে সলিল-প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আসলে সলিল এমনই এক মহাসমুদ্র যাঁর প্রভাব এড়ানো আজও সম্ভব নয়। সলিল হলেন সুরকারদের গুরু মহাসুরকার।

সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সবাই জানে ফিল্ম জগতে রয়েছে নানারকম ঘোরপ্যাঁচ। কেউ একটু ওপরে উঠলে তাকে টেনে নীচে নামানোর জন্য লোকের অভাব হয় না। আর সবার ওপরে আছে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। সলিল চৌধুরীও এই রোগের হাত থেকে রেহাই পান নি। সম্ভবত সেই রকমই এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এক সময়ের দুই অভিন্ন আত্মা সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। একটা সময় ছিল যখন দুজনেই ছিলেন দুজনের খুব কাছে। সলিলের সুর আর হেমন্তর কন্ঠ এক সময় ঝড় তুলেছিল বাঙালীর মনে। একশোরও বেশি গানে দুজনে ছিলেন একসঙ্গে। সেই সময় সলিল হেমন্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যদি কোনোদিন ভগবান মনে করেন তিনি গান গাইবেন, তাহলে যে কন্ঠটিকে তিনি বেছে নেবেন সেটি অবশ্যই হবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠ।' বহুদিন তাঁরা দুজনে একসাথে গানে গানে আমাদের ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর? হঠাৎ একদিন সব কেমন হয়ে গেল। আর সলিলের সুর বাঁধা পড়ল না হেমন্তর কন্ঠে। এ ব্যাপারে বহুদিন পরে হেমন্তর এক স্মৃতিসভায় সলিল বলেছিলেন, 'আসলে সব জায়গাতেই এক শ্রেণীর লোক থাকেন, যাঁরা দুজনের মধ্যে ভাঙন ধরাতে ভীষণ পটু। এই শ্রেণীর লোকেরাই কখনো হেমন্তর কাছে গিয়ে বলত, আমি নাকি তাদের বলেছি, হেমন্ত কোনোদিনই হেমন্ত হতে পারত না যদি না সলিল চৌধুরীর গান গাইত। আবার এরাই আমার কাছে এসে বলত, হেমন্ত নাকি বলে বেড়াচ্ছে, আজ যে সলিল এত বিখ্যাত হয়েছে সে তো স্রেফ আমার জন্য। আমি যদি তার সুরে না গাইতাম তাহলে সলিল কোথায় যেত! আর সত্যি কথা বলতে কি, আমরা দুজনেই তাঁদের ফাঁদে পড়েছিলাম'। বোঝাই যায় এ ধরনের নোংরা খেলার পেছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করে। ফলে ভাঙন ধরে গেল সলিল আর হেমন্তর মধ্যে। বহুদিন তাঁরা আর একসাথে কাজ করেন নি। পরে যখন তাঁদের ভুল ভাঙল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুজনেরই সেই সোনালী যুগ তখন শেষের দিকে।

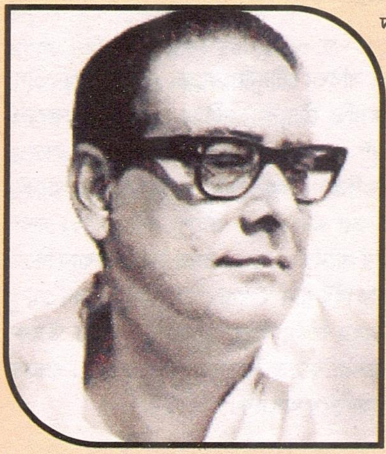

> 'আমি মনে মনে চেয়েছি, আমি যেন এমন কোন কিছু তৈরি করতে পারি যাতে আমার দেশের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে এক হতে পারে। আর তাহলেই সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের এই দেশ সত্যিই পথ দেখাতে পারবে।'

সলিল ও বাংলাদেশ

সলিল চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর অনেকগুলি গান লিখেছিলেন এবং সুরও দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই গানগুলো ভীষণ কাজে লেগেছিল। গানগুলো প্রায় ৩৭ বছর ধরে টেপবন্দী হয়ে ছিল। কয়েকদিন আগে কোলকাতার একটি ক্যাসেট কোম্পানী সেগুলো বাজারে নিয়ে এসেছেন। গানগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন কি আগুন ঝরানো মানসিকতা নিয়ে তিনি গানগুলি লিখেছিলেন। ভেতর থেকে তাগিদ না আসলে এরকম গান লেখা সম্ভব নয়। এপার বাংলা সেইসময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ভাবে সহযোগিতা করেছিল তা এই গানগুলোই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

সলিল চৌধুরী ও পশ্চিমী সঙ্গীত

বাবার ছিল প্রচুর বিদেশী সংগীতের সংগ্রহ। ছোটবেলা থেকে সেসব শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতেন সলিল। মোৎজার্ট, চায়কোভস্কি, বিটোফেনে মজে যাওয়া সলিল চেয়েছিলেন এই সব অসাধারণ সুরকে ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশিয়ে পৌঁছে দেবেন একেবারে সাধারণের মাঝে। কাজ শুরু করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন আর একজনকে। তিনি দেখলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গানের সুর করেছেন বিদেশী গানের ভাবধারায়। পরবর্তী আমলে যখন তিনি বোম্বে গেলেন তখন অনেক ছবির সুরে তিনি কাজে লাগালেন তাঁর এই অভিজ্ঞতা। দু-একটা উদাহরণ এখানে দিয়ে রাখি, 'ছায়া' ছবিতে তিনি মোৎজার্টের ৪০ নম্বর সিম্ফোনীকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করলেন একটি অসাধারণ গান, 'ইতনে না মুঝসে তু প্যার বধা'। অন্নদাতায় 'রাতোঁ কে সায়া ঘনে' গানের সুরের ক্ষেত্রে অনেকখানি অবদান রয়েছে চোপিনের। এ রকম বহু গানের সুরে সলিল মিলিয়েছেন পশ্চিম আর পুবকে। রুডিয়ার্ড কিপলিঙের উদ্ধৃত উক্তি – East is east and west is west এই কথাকে ভুল প্রমাণিত করে তিনি দেখিয়ে দিলেন ইচ্ছে থাকলে সবই সম্ভব।

সলিল ও তাঁর পরিবার

সলিল চৌধুরী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে। এটি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর নাম সম্ভবত জ্যোতি চৌধুরী। সবিতা চৌধুরীও একজন নামকরা সঙ্গীত শিল্পী। সলিলের দুই কন্যা ও দুই পুত্র। বড় মেয়ে অন্তরা ইতিমধ্যেই একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী। এক সময় ছোটদের গান মানেই সবাই বুঝত অন্তরাকে। দারুণ মিষ্টি গলা এবং ভীষণ ভালো সঙ্গীতবোধ। বাবা সলিল চৌধুরী সম্ভবত অন্তরাকেই তাঁর গানের জগতের সমস্ত উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। কিছুদিন আগেই সুধীর মিশ্র'র হিট গান 'খোয়া খোয়া চাঁদ' করেন সোনু নিগমের সঙ্গে। অন্তরা খুবই প্রতিভাধর শিল্পী, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁকে সেইভাবে আমাদের এখানকার মানুষেরা কাজে লাগাতে পারলেন না। ছেলে ববি চৌধুরীও সঙ্গীত জগতের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন।

কবিতা
শপথ
সলিল চৌধুরী

পাষাণী অহল্যা ওগো সেই রাজপথ,
কান পেতে কি আমার আগমনী শোন!
আমিও তো কান পাতি
আঘাতবিদীর্ণ সিক্ত শক্ত ক্ষতমুখে –
কোথায় সমুদ্র গর্জে তরঙ্গে উত্তাল
কোথায় কোরিয়া আর অন্ধ্র, কাকদ্বীপ,
রক্তে আঁকা মানচিত্র নব পৃথিবীর।
পায়ে পায়ে সেই পথে চলি –
আমার এ অঙ্গরাগ মিছিলের পায়ে-ওড়া ধূলি
আমার এ কর্মকার মন –
ক্রমাগত শ্বাস টেনে হাপরের মত
জ্বেলে রাখে চেতনা-আগুন,
হৃদয়-পিন্ডের ঘায়
তপ্ত লাল ইস্পাতের শপথ শানায়।
তবু ওগো অহল্যা আমার!
কোথায় বসাব বল তুমি ফিরে এলে,
আমার কুটিরে আর জ্বলে নাকো আলো
ভাঙা ছাদ টলোমলো বৃষ্টি এসে পড়ে।
স্তূপাকার ভগ্ন আশা আবর্জনারাশি
পরগাছা সরিসৃপ ভয়াল কুটিল
বাসা বেঁধে আজ, যেথা একদিন ছিল
প্রিয়ার চোখের মায়া শিশুদের হাসি।
অহল্যা আমার শোন!
আমারও তো শান্তি নেই –
আমার বুকের দুর্গে করে আক্রমণ
ফ্যাসিস্ট দস্যুর মত যক্ষ্মা-বীজ এসে।
তবু আমি প্রাণপণে টেনে যাই শ্বাস
আমার বিশ্বাস – জানি রক্ত কণিকারা
লাল ফৌজের মত জয় সুনিশ্চিত
আবার দখল নিয়ে দেবে প্রত্যাঘাত –
অমর স্তালিনগ্রাদ
আবার আমারই বুকে ফিরে পাব আমি॥

সলিল চৌধুরী নিজেই এই গানটি গেয়েছেন

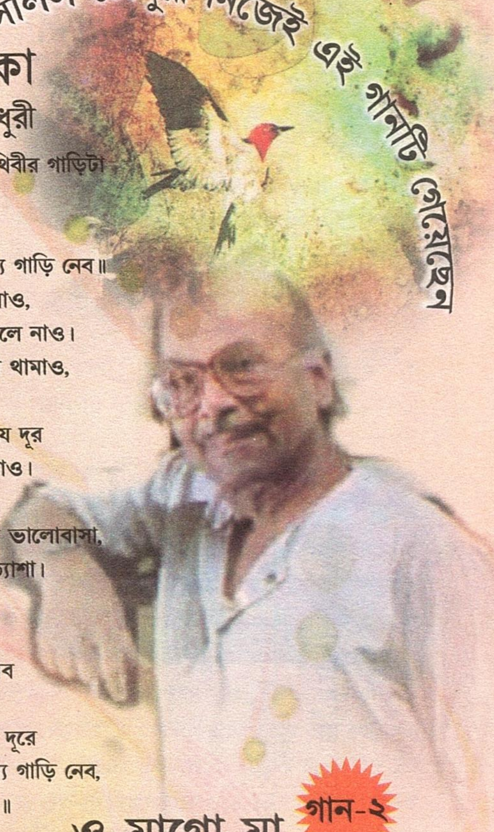

গান ১ এই রোকো
সলিল চৌধুরী

এই রোকো, এই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা
থামাও
আমি নেমে যাব –
এ গাড়ি যাবে না, আমি অন্য গাড়ি নেব॥
আমার স্বপ্নভরা লাগেজ নামাও,
এই কুলি, মহাকাল কাঁধে তুলে নাও।
এই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও,
আমি নেমে যাব —
নিজের বৃত্তে ঘুরে মরে, না যে দূর
এই গাড়িটাতে তুলে দিয়ে যাও।
ভাড়াটা বড্ড বেশি –
এক হাজার মায়া আর দুটো ভালোবাসা,
খুচরো খরচ কিছু আশা প্রত্যাশা।
তাছাড়া
জলাঞ্জলি দিতে হল ভাষা।
তাহোক, তবু আমি নেমে যাব
পৃথিবীর গাড়িটা থামাও।
আমার টিকিট কাটা অনেক দূরে
এ গাড়ি যাবে না, আমি অন্য গাড়ি নেব,
এই পৃথিবীর গাড়িটা থামাও॥

ও মাগো মা গান-২

ও মাগো মা, অন্য কিছু গল্প বলো
এক যে ছিল রাজা-রাণী অনেক হলো।
বলো না কেন, ওই ওপাড়ার দাসির ছেলে
জ্বরেতে ভুগে না খেতে পেয়ে মারা গেল।
এই যে এতসব সারি সারি
বড় বড় বাড়ি আর এত গাড়ি,
তবু কেন এতো লোকে ফুটপাথে শোয়
তা বলো না –
কেন সেদিন অঞ্জনাকে স্কুলের থেকে
মাইনে দিতে পারে নি বলে তাড়িয়ে দিল?
যখনই প্রশ্ন করি, বলো তুমি –
'বড় হও তারপরে জানবে তুমি'।
কেন মাগো এতো লোকে ভিক্ষে করে
তা বলো না –
বলো না কেন?
তাতানরা দুভাই ঘরেতে বেকার
ওরাতো দুজন লেখাপড়ায় ভালোই ছিল।
ও মাগো মা, অন্য কিছু গল্প বলো,
এক যে ছিল রাজা-রাণী অনেক হলো॥

অন্তরা চৌধুরী গেয়েছেন
ও মাগো মা
সুর ও লেখা : সলিল চৌধুরী
(গানটি ছোটদের
জন্য লেখা হলেও
কথাগুলো একটু খেয়াল
করবেন, তাহলেই
সলিল চৌধুরীকে চেনা
সহজ হয়ে যাবে)

সলিল চৌধুরী কি বোকা ছিলেন?

তিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন একটি সঙ্গীত গবেষণা কেন্দ্র। তৈরি করেছিলেন 'সাউন্ড অন সাউন্ড' বলে একটি রেকর্ডিং স্টুডিও।

এখনকার লোকের চোখে তিনি অবশ্যই একজন বোকা মানুষ। কারণ এখন যেভাবে মানুষ পয়সা বা যশের জন্য নীতি বা আদর্শ বিসর্জন দিতে পারে তা তিনি পারেন নি। তাঁর নিজের তৈরি বিশাল সাম্রাজ্য তিনি নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে এসেছিলেন। সামান্য একটু সমঝোতা করতে পারলেই তিনি অনায়াসে সম্রাট হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু কেন তিনি এমন করলেন? সেটা ভালভাবে বুঝতে গেলে মানুষটাকে পুরোপুরি চিনতে হবে। সলিল চৌধুরীরা এমন জাতের মানুষ যাঁরা এই রকম ধাতেরই হন। নিজে আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাস করতেন, চোখের সামনে দেখেছেন অনেক কিছু। সেই মানুষটাই যখন দেখেন বামপন্থীরা কেমন করে পাল্টে যাচ্ছেন তিনি কষ্ট পেয়েছেন। যে বিশ্বাসের ওপর ভর করে নিজের জীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই বিশ্বাসকে চোখের সামনে ভাঙতে দেখে দুঃখ পেয়েছেন। যে সব মানুষকে তিনি দেখেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর সঙ্গে লড়তে তারাই যখন একটু আরামের আশ্বাস পেয়ে পাল্টে যান তখন তিনি অবাক হয়েছেন। সমাজ যখন আস্তে আস্তে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তিনি তখন তা ঠেকাবার জন্য পাশে কাউকে পান নি। বাম আন্দোলনকে যখন দেখেছেন শুধুমাত্র রাজনীতি নির্ভর হয়ে উঠতে তখন তিনি আরো বিস্মিত হয়েছেন। শোষিত যখন শাসক হয়ে নিজেই আবার কেমন করে শোষক হয়ে ওঠে তাও তিনি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন মিডিয়া কি করে সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে। মানুষ কেমন করে অন্ধের মত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে সেই মিডিয়ার ফাঁদে পড়ে নাকাল হচ্ছে। যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে তিনি লড়তে নেমেছিলেন সেই সিস্টেম যখন আস্তে আস্তে সবাইকে গিলে ফেলছে তা দেখে তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি। নিজে একাই চেষ্টা করেছিলেন আবার লেখনি ধরতে, আবার গানকে হাতিয়ার করতে। তিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন একটি সঙ্গীত গবেষণা কেন্দ্র। তৈরি করেছিলেন 'সাউন্ড অন সাউন্ড' বলে একটি রেকর্ডিং স্টুডিও। চেয়েছিলেন অনেক কিছু করতে, কিন্তু সময় তাঁকে সে সুযোগ আর দেয় নি। ১৯৯৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি আমাদের ছেড়ে বড় দুঃখ পেয়ে চলে যান।

সলিল ও পুরস্কার

- ১৯৫৮ সালে মধুমতী ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান।
- ১৯৮৮ সালে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি তাঁকে তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করে।